অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে প্রযুক্তির ব্যবহার

আশফাক আহমেদ

দেশে ২০২৩ সালে মোট ২৭ হাজার ৬২৪টি অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে বলে জানিয়েছে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স। এই হিসাবে প্রতিদিন গড়ে ৭৭টি আগুনের ঘটনা ঘটেছে। এতে সারা দেশে মোট ২৮১ জন আহত এবং ১০২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর্থিক হিসাবে সারা দেশে এসব অগ্নিকাণ্ডে ৭৯২ কোটি ৩৬ লাখ ৮২ হাজার টাকা মূল্যের সম্পদের ক্ষতি হয়। বৈদ্যুতিক গোলযোগ, সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরা, চুলা ও গ্যাসের লাইন থেকে আগুন লাগার ঘটনা সবচেয়ে বেশি।

ফায়ার সার্ভিসের তথ্য অনুযায়ী, শুধুমাত্র ঢাকাতেই ২৬০০ ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকিতে রয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে বিপণি বিতান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও আবাসিক ভবন। এসব স্থানে প্রতিদিন হাজারো মানুষ যাতায়াত, অথচ তাদের অনেকে হয়তো বিষয়টি জানেই না। নগর পরিকল্পনাবিদরা বলছেন, নোটিশ দেওয়ার পরেও কাজ না হলে কঠোর পদক্ষেপ নিতে। কিন্তু এতদূর কেন যেতে হবে। কোনো ভবনে বা স্থাপনায় অগ্নিকাণ্ড হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন সেখানে বসবাসকারী, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বা ভবন মালিক। নিজেদের নিরাপত্তার জন্য সতর্ক থাকাটা সবার আগে কি নিজেদের দায়িত্ব নয়?

বাংলাদেশে বেশিরভাগ ভবন ও বাসা-বাড়িতে অগ্নি নিরাপত্তার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। এ কারণেই দুর্ঘটনার সময় ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা যায় না। প্রথমত, অগ্নিকাণ্ড ঠেকাতে বা এর ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনতে হলে ভবন নির্মাণ পর্যায় থেকেই নিতে হবে প্রস্তুতি। আগুন লাগলে সেটি ছড়িয়ে পড়া অনেকাংশেই ঠেকানো সম্ভব যদি আগে থেকেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যায়। কোনো ভবনের অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে ভবনে দুটি বিষয় নিশ্চিত করতে হবে। একটি হলো অ্যাকটিভ সিস্টেম বা সক্রিয় ব্যবস্থা এবং অন্যটি প্যাসিভ সিস্টেম বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। অগ্নি নিরাপত্তায় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি। বাড়ি নির্মাণের সময় মূল নকশার সাথে এটি সংযুক্ত রাখার বিষয়টি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারকে নিশ্চিত করতে হবে।

আগুন ধরে গেলে সেটি ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে রয়েছে নানা ধরনের পদক্ষেপ। বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের সাথে জড়িত ভবনগুলোতে এ ধরনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করায় সেখানে আগুন লাগার ঘটনা কমে এসেছে। আগুন লাগলেও তা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকছে এবং প্রাণহানি কম হয়। কোনো ভবনে অগ্নিকাণ্ড ঠেকাতে যেসব বিষয় নিশ্চিত করা উচিত সেগুলো জানা থাকা জরুরি।

আধুনিক বহুতল ভবনগুলিতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, হিটিং, বিদ্যুৎ এবং গ্যাস সংযোগের জন্য যে পাইপগুলো টানা হয়, সেগুলো যায় ডাক্ট লাইন এবং ক্যাবল হোলের ভেতর দিয়ে। এই ডাক্ট লাইন ও গর্ত দিয়ে ধোঁয়া এবং আগুন খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। এজন্যে ডাক্ট লাইন ও ক্যাবল হোলগুলো আগুন প্রতিরোধক উপাদান দিয়ে ভালো করে বন্ধ করে দিতে হবে। এছাড়া ভবনের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার জন্য ব্যবহৃত কোনো কিছুর মাধ্যমেও যাতে আগুন ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ভবন নির্মাণের সময় কী ধরনের উপাদান ব্যবহার করা হচ্ছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভূমিকম্প এবং আগুন লাগার মতো দুর্ঘটনা ঠেকাতে এ ধরনের উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে দরজা এবং দেয়াল আগুন প্রতিরোধী হলে ভালো হয়। এছাড়া ঘরের সিলিং, রান্নাঘরের আসবাবপত্র আগুন প্রতিরোধী পদার্থে নির্মাণ এবং আগুন প্রতিরোধী তার ব্যবহার করলে আগুন লাগলেও সেটি ছড়িয়ে পড়ার ভয় থাকে না। সিনথেটিক বা হাইড্রোকার্বন উপাদান থাকে এমন কোনো পদার্থ দিয়ে ভবনের ভেতরের সাজসজ্জা না করাই ভালো। এসব উপাদানের মাধ্যমে একদিকে যেমন আগুন দ্রুত ছড়ায়, অন্যদিকে আগুন লাগলে এসব উপাদান পুড়ে বিষাক্ত ধোয়া তৈরি হয় যা নিঃশ্বাসের সাথে গ্রহণ করলে মানুষ প্রায় সাথে সাথেই অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। এই ধোঁয়ার কারণে প্রাণহানির ঝুঁকি বাড়ে।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়ার পরও যদি কোনো ভবনে আগুন লাগে তাহলে সেক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার একটা উপায় হচ্ছে ফায়ার এবং স্মোক অ্যালার্ম সিস্টেম বসানো। অ্যালার্ম সিস্টেম কাজ করলে কোনো এক জায়গায় আগুন লাগলে পুরো ভবনের বাসিন্দারা আগুন সম্পর্কে জানতে পারে। দ্রুত তারা ভবন খালি করে নিচে নামতে পারবেন। ফলে প্রাণহানির ঝুঁকি কমানো সম্ভব। যেকোনো ভবনেই আগুন লাগলে সেটি থেকে বের হয়ে আসার জন্য বাইরে একটা জরুরি বর্হিগমন পথ থাকতে হবে। এটা হতে হবে এমন একটি পথ যেখানে আগুন এবং ধোঁয়া প্রবেশ করতে পারবে না। কারণ কোনো ভবনে আগুন লাগলে বা ভূমিকম্প হলে ওই ভবনের লিফট ব্যবহার না করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

প্রতিটি ভবনেই অগ্নি নির্বাপন সিলিন্ডার বা ফায়ার এক্সটিংগুইশার থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একইসাথে ভবনের বাসিন্দাদের এগুলো ব্যবহার করতে জানতে হবে। কোনো ভবনে আগুন লাগলে সেটি ছড়িয়ে পড়তে কিছুটা হলেও সময় লাগে। এই সময়ের মধ্যে যদি অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা দিয়ে সেটি নিভিয়ে ফেলা যায় তাহলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব। আগুন লাগার পর প্রথম দুই মিনিটকে বলা হয় প্লাটিনাম আওয়ার বা সবচেয়ে মূল্যবান সময়। এই সময়ে ঘাবড়ে না গিয়ে ঠান্ডা মাথায় ব্যবস্থা নিলে ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব।

আগুন নেভানোর জন্য একটা প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা হচ্ছে স্প্রিঙ্কলার সিস্টেম। এটি কোনো ভবনের পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সাথে যুক্ত থাকে। এই ব্যবস্থায় কোনো স্থানে তাপমাত্রা ৫৭ ডিগ্রির বেশি হলে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিস্ফোরিত হয়ে পানি ছিটাতে শুরু করে। ফলে আগুন নিভে যায়। বড় বড় বাণিজ্যিক বা কারখানা ভবনে সাধারণত এগুলো ব্যবহার করা হয়। অনেক আবাসিক ভবনেও এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। শুধু প্রযুক্তি থাকলেই হবে না, কিছু বিষয় সবাইকে জানতেও হবে। যাতে দুর্ঘটনার সময় তাৎক্ষণিক করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। প্রাথমিকভাবে জানতে হবে যে, ফায়ার এক্সটিংগুইশার কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। আগুন লাগলে কিভাবে ফায়ার সার্ভিসকে ডাকতে হবে। ভবনে আগুন লাগলে সেখান থেকে কিভাবে বের হয়ে আসতে হয়। এ জন্য মহড়ার ব্যবস্থা করে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। আগুন লাগলে কার কী দায়িত্ব তা আগে থেকেই ভাগ করে নিতে হবে। আগুন থেকে উৎপন্ন ধোঁয়া যাতে কেউ নিঃশ্বাসের সাথে গ্রহণ না করে, ভবন থেকে নামতে যাতে সিঁড়ি ব্যবহার করে, ভেজা তোয়ালে দিয়ে মুখ ঢেকে নিরাপদ স্থানে সরে যেতে হবে। এ বিষয়গুলো অবশ্যই জানতে হবে। এছাড়া কোনো অবস্থাতেই ঘাবড়ে না গিয়ে ভবন থেকে লাফিয়ে পড়া থেকে বিরত থাকতে হবে। এছাড়া বহুতল ভবনগুলোতে অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। যাতে করে আগুন লাগলে তারা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনতে পারে।

বর্তমানে দেশে প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ বইছে। বাড়ছে তাপমাত্রা। এই সময়ে ছোট একটা স্ফুলিঙ্গ বড় অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটাতে পারে। তাই প্রতিষ্ঠান ও আবাসনকে অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করতে সবার আগে নিজেদের সচেতন হতে হবে। যেমন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহারে অতি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারখানা ও বাসার বৈদ্যুতিক ক্যাবল ওয়্যারিং ঠিক আছে কিনা খেয়াল রাখতে হবে। ত্রুটিপূর্ণ ক্যাবল পরিবর্তন করতে হবে। সিগারেটের শেষাংশ অবশ্যই নিভিয়ে নিরাপদ স্থানে ফেলতে হবে। তাপদাহের সময়ে বাড়ির ছাদে, বারান্দায় বা খোলা স্থানে বারবিকিউ না করাই উত্তম। কারণ একটু স্ফুলিঙ্গ উড়ে গিয়ে বড় অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। এই সময়ে ক্যাম্পফায়ার, আতশবাজি, ফানুস উড়ানো উচিত না।